১

সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, বিষয়বস্তু, পরিধি ও স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে দাবি
[Definition, Nature, Subject Matter, Scope and Claim to be an Autonomous Discipline]

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সংজ্ঞা

অত্যন্ত সাধারণ ভাষায় আমরা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে বুঝি সেই বিষয় যা জাতি-রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বরাষ্ট্রব্যবস্থার (World State System) বিভিন্ন এককের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়টির আবির্ভাব নিয়ে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, যেসময় থেকে জাতি-রাষ্ট্র (nation-state) তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতনতা অর্জনে সচেষ্ট হয়ে নানা রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তুলতে শুরু করল এবং তার থেকে যে মিথস্ক্রিয়ার জন্ম ঘটল তাকে নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গোড়াপত্তনের পর্ব বলে চিহ্নিত করা চলে। জাতি-রাষ্ট্রগুলির জন্ম কখন হয়েছিল সে বিষয়ে সঠিকভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে কমবেশি সমস্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন যে ওয়েস্টফেলিয়ার শান্তিচুক্তির (Peace Treaty of Westphalia, 1648) পর থেকেই জাতি-রাষ্ট্রের সাড়ম্বর আবির্ভাব ঘটে এবং এটি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি সক্রিয় কারকের (actor) ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় যা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সূচনা করে। কারণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যেকার সম্পর্ক। আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে আমরা মিথস্ক্রিয়া বলতে পারি এবং এই মিথস্ক্রিয়া দেখা দিল যখন রাষ্ট্র বা জাতি-রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক সমাজে নানা বিষয়ে সক্রিয়তা দেখাতে লাগল। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হল জাতি-রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে স্থাপিত বা গড়ে তোলা সম্পর্ক। এই প্রসঙ্গে আমরা জনৈক বিশেষজ্ঞের মন্তব্য স্মরণ করতে পারি : The term international relations is used to identity all interactions between state-based actors across state boundaries. অথবা দেখা যাচ্ছে যে একটি জাতি-রাষ্ট্র তার সীমানার বাইরে অবস্থিত অন্য জাতি-রাষ্ট্রের সঙ্গে যখন সম্পর্কে লিপ্ত হয় এবং তা যখন একটি স্পষ্ট মিথস্ক্রিয়ার আকার গ্রহণ করে তখন তাকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নামে অভিহিত করা যেতে পারে। কিন্তু এই সম্পর্ক কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে বন্দি থাকে না বলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে সীমিত গন্ডির মধ্যে রাখা যায় না। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে আমরা যা বুঝি তার কেন্দ্রীয় ধারণাটি হল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে যে মিথস্ক্রিয়া গড়ে ওঠে তাকেই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলা যেতে পারে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ধারণাটির মধ্যে যেসমস্ত বিষয় বা ধারণা নিবিড়ভাবে জড়িত তা হল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা, জাতি-রাষ্ট্র, তার সক্রিয় ভূমিকা যাকে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা 'কারক' নামে অভিহিত করেছেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে তৈরি হওয়া সম্পর্ক এবং বাস্তবে আমরা যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করি তা কোনো একটি নির্দিষ্ট রাস্তা ধরে প্রবাহিত হয় না। সে-কারণে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে বোঝায় **বহুধাবিভক্ত ধারাগুলিকে (disciplines) নিয়ে গঠিত একটি বিষয় যার নির্দিষ্ট একটি কাঠমো থাকলেও সেই কাঠামোর অভ্যন্তরস্থ বিষয়গুলির পরিবর্তনশীলতা সতত বিদ্যমান।** অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যে রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন ইত্যাদি বহু বিষয় স্থান করে নিয়েছে এবং এরা বিষয়টিকে সমৃদ্ধিশালী করেছে।

বৈশিষ্ট্য

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ থেকে এর যে-সমস্ত বৈশিষ্ট্য বেরিয়ে আসে তাদের কয়েকটির উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। *প্রথমত,* আন্তর্জাতিক সমাজের

Scanned with CamScanner

বিভিন্ন এককের (যাদেরকে জাতি-রাষ্ট্র বলা হয়) মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হলেই তাকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলা যায় না। সম্পর্ককে আন্তর্জাতিক হতে হলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্ককে **ধারাবাহিক, স্থিতিশীল ও প্রণালীবদ্ধ হতে হবে।** প্রাচীনকালে ভারতের সঙ্গে চিন, জাপান, সিংহল (এখনকার নাম শ্রীলঙ্কা) এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। বৌদ্ধধর্মের জন্ম ভারতে হলেও ভারতের বাইরে এর প্রভাব ও প্রচার ঘটেছিল। সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছাড়া বাণিজ্যিক সম্পর্ক বা লেনদেন স্থাপিত হয়েছিল। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিল্ক রুট (silk route) দিয়ে চিনের সঙ্গে ভারতের ব্যাবসাবাণিজ্য হত। সেই সিল্ক রুটের পুনরুজ্জীবন এখন ঘটানো হয়েছে। ভারতের সঙ্গে এই সমস্ত দেশের সম্পর্ককে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নামে চিহ্নিত করা যায় না কারণ ধারাবাহিকতা, স্থিতিশীলতা ও প্রণালীবদ্ধতা ছিল না। এখানে প্রণালীবদ্ধতা বলতে আমরা বুঝি কতগুলি নির্দিষ্ট পদ্ধতি বা নিয়ম মেনে সম্পর্কের পরিচালন হয়নি।

দ্বিতীয়ত, **সম্পর্ককে আন্তর্জাতিক হতে হলে প্রয়োজন কতকগুলি আচরণবিধি মেনে চলা এবং এগুলি কোনো একটি রাষ্ট্র তৈরি করবে না।** অনেকগুলি রাষ্ট্রকে নিয়ে গঠিত হবে আন্তর্জাতিক সমাজ (international society) এবং এই সমাজ যে নিয়ম বা আচরণবিধি তৈরি করে দেবে তা আন্তর্জাতিক সমাজের সকল সদস্যকে মেনে চলতে হবে। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝির আগে এই জাতীয় সমাজের অস্তিত্ব ছিল না যে কারণে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে সম্পর্ক প্রচলিত ছিল তার পরিচালনের পেছনে কোনো আচরণবিধির অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়নি। সুতরাং সম্পর্ক তখনই আন্তর্জাতিক হবে যখন সেই সম্পর্কের ভিত্তি হবে মোটামুটি সর্বজনগ্রাহ্য আচরণবিধি।

তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও বিদেশনীতি থেকে স্বতন্ত্র করে বিচার করা হয়ে থাকে। কে. জে. হোলস্টি (K.J.Holsti) মনে করেন যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আন্তর্জাতিক সমাজের বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে নানাপ্রকার মিথস্ক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সরকারি ও অ-সরকারি সকল স্তরে এককগুলির মধ্যে যে আদানপ্রদান সংঘটিত হয় তাদের সবগুলিকে নিয়ে আলোচনা করে। অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে বিদেশনীতি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির তুলনায় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি খুবই ব্যাপক (As distinct from international politics and foreign policy, the term international relations may refer to all forms of interaction between the members of separate societies whether government sponsored or not. The study of international relations includes the analysis of foreign policy or political processes between nations. (*International Politics, A Framework for Analysis,* p. 10)।

চতুর্থত, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়টির মধ্যে দুটি পরস্পর-বিরোধী বিষয় বা চিন্তা বা ধারণার সমাবেশ ঘটেছে। একটি হল বাস্তববাদ (realism) এবং অন্যটি হল কাল্পনিকতা (utopianism)। তবে ই. এইচ. কার মনে করেন যে এই বিদ্যামূলক বিষয়টির প্রাথমিক পর্যায়ে কাল্পনিকতার বিস্তর প্রাধান্য বিরাজ করত। তাঁর কথায় : In its early stages the subject was markedly and frankly utopian for the passionate desire to prevent war determined the whole initial course and direction of the study. আমরা মনে করি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে ই. এইচ. কার-এর মূল্যায়ন বহুলাংশে সঠিক। কারণ বিশ শতকের গোড়ায় এবং এমনকি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বিষয়টি মূলত কতকগুলি ভাববাদী বা কাল্পনিক বা অবাস্তব চিন্তাভাবনার দ্বারা পরিচালিত হত। অনেকে মনে করতেন যে মানুষের মনে শুভবুদ্ধির উদ্ভব হবে এবং সেই পরিস্থিতি বিশ্বকে যুদ্ধ ও নানা ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম থেকে রক্ষা করবে এবং এই মানসিকতা থেকে জন্ম নিয়েছিল 'লিগ অফ নেশনস' নামে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন যার কেন্দ্রে অবস্থান করত যৌথ নিরাপত্তা (collective security)। কার বলেছেন যে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্পষ্টতই ইউটোপীয় বা কাল্পনিক চিন্তার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কারণ যৌথ নিরাপত্তার সারকথা হল যে একটি রাষ্ট্র অন্যায়ভাবে অন্যের দ্বারা আক্রান্ত হলে অন্যান্য রাষ্ট্র তার সাহায্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসবে। বাস্তবে দেখা গেল যে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থাটি কাজ করতে পারেনি এবং সে-কারণে কার বলেছেন : Collective security system clearly revealed the inadequacy of pure aspiration as the basis for a science of international politics and made it possible for the first time to embark on serious and critical analytical thought about international problems.

পঞ্চমত, বর্তমানে আমরা যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পড়ি তাকে অনেকাংশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালের ঘটনা বলে অনেকে মনে করতে চান এবং এহেন ভাবনা তৈরি করার পেছনে একাধিক কারণ আছে যাদের মধ্যে প্রধানটি হল : দ্বিতীয় মহাসমরের পরে বিশ্বের রাজনীতিক ও ভৌগোলিক মানচিত্র আমূলভাবে বদলে যায়। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে যাঁরা গভীর আলোচনা করেন তাঁরা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে

Scanned with CamScanner

বিষয়টি নিয়ে নতুন প্রেক্ষিতে আলোচনা করার তাগিদ অনুভব করেন এবং তার থেকে জন্ম নেয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। তবে এই বৈশিষ্ট্যকে খুব বেশি দীর্ঘায়িত বা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা অনুচিত। কারণ সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। অতীতে এই বিষয়ের মধ্যে যে অবাস্তবতা, আবেগ প্রভৃতি স্থান করে নিয়েছিল সেগুলি সাম্প্রতিককালের আন্তর্জাতিক সম্পর্কে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে নেই এবং তার প্রধান কারণ হল রাষ্ট্রসংঘের সনদেও যৌথ নিরাপত্তা ও ভাববাদের একাধিক উপাদান নিহিত।

ষষ্ঠত, কল্পনা ও আবেগের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি নিগূঢ় সম্পর্ক থাকলেও এবং সে সম্পর্কে আমরা সম্যকরূপে অবহিত হলেও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন নয়। কারণ বিশ্বের নানাপ্রান্তে প্রতিনিয়ত যেসমস্ত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তারা তাদের গুরুত্ব অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়টির মধ্যে নিজের স্থান করে নিয়েছে। অর্থাৎ সাম্প্রতিককালের কোনো ঘটনাকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বাদ দেয়নি বা বাতিল করেনি। তবে ঘটনার মধ্যে আন্তর্জাতিকতা থাকা চাই। সেদিক থেকে বিচার করে বলা যেতে পারে যে সমাজবিজ্ঞানের অপরাপর শাখার তুলনায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একটু বেশিমাত্রায় পরিবর্তনশীল। ফলে এমন অনেক শব্দ বা term এই বিষয়টিতে পাওয়া যায় যা অন্য কোনো বিষয়ে নেই এবং এমনকি অতীত দিনের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যেও ছিল না। যেমন স্নায়ুযুদ্ধ (cold war) বিবাদাবসান (detente) বা নিবৃত্তকরণ (deterrent) বা দ্বিমেরুতা (bipolarity) বা একমেরুতা (unipolarity) প্রভৃতি। বিশ শতকের আটের দশকের শেষ অবধি বিশ্বরাজনীতির বিরাট প্রাঙ্গণে দ্বিমেরুতা ছিল একটি অত্যন্ত পরিচিত নাম। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সারা বিশ্বে আমেরিকা বাধাহীনভাবে বিচরণের সুযোগ পাওয়ায় একমেরুতা শব্দটি পরিচিতিলাভ করেছে। অতি সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সন্ত্রাসবাদ (terrorism) নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করছে। কারণ ক্ষুদ্র, বৃহৎ, ক্ষমতাবান, ক্ষমতাহীন সকল শ্রেণির রাষ্ট্রের নিকট সন্ত্রাসবাদ আতঙ্কের বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

সপ্তমত, বিশ্বায়নের যুগে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে বলে আমরা মনে করি। কারণ, যদিও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মূলত জাতি-রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে নানাবিধ আলোচনা করে, তবে প্রয়োজনে অন্যান্য বিষয়কেও আলোচনার অঙ্গীভূত করতে দ্বিধাগ্রস্ত নয়। যেমন আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ, বহুজাতিক সংস্থা প্রভৃতি। বিশ শতকের আটের দশক থেকে বিশ্বায়ন (globalisation) তার যাত্রা শুরু করেছে এবং সমস্ত দিক থেকে বিচার করে বলা যেতে পারে যে বিশ্বায়ন অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্বায়নের সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে কোনোভাবে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি। বরং সে নিজেকে এর অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছে। এমন কথা বলা অসংগত নয় যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কোনো সফল আলোচনা বিশ্বায়নকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। যে জাতি-রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়টির মূল স্থান অধিকার করেছিল (এবং আজও আছে) সেই জাতি-রাষ্ট্র আজ বহুলপরিমাণে সংকটের মধ্যে পড়েছে। বিশ্বায়নের মধ্যাহ্নকালীন পর্বে জাতি-রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নিয়ে কোনো সংশয় দেখা না দিলেও এর অতীত দিনের প্রভাব যে পুরোমাত্রায় আজ নেই সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিশ্বায়নের বিবরণ কেবল রাজনীতির ক্ষেত্রে বন্দি নেই, অর্থনীতি, ব্যাবসাবাণিজ্য যোগাযোগ, প্রযুক্তির হস্তান্তর ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন তার সক্রিয় উপস্থিতি সাড়ম্বরে ঘোষণা করছে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তাকে উপেক্ষা করে বিশ্বায়ন-পূর্ব পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখতে চাইছে না।

অষ্টমত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে কয়েক দশক বিশ্বের দুই পরাশক্তি (super power) বিশ্বরাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করত এবং এশিয়া, আফ্রিকার বিকাশশীল দেশগুলির ক্ষীণ কণ্ঠস্বর বৃহৎশক্তিবর্গের কানে পৌঁছোত না। অত্যাচার এবং শোষণের শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভ করার পরেও বিশ্বরাজনীতিতে এরা ছিল উপেক্ষিত। কিন্তু শেষপর্যন্ত ঘটনা-প্রবাহের চাকা উলটো দিকে ঘুরতে শুরু করে। রাষ্ট্রসংঘে বা অন্য কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থায় বা মিলনমেলায় এরা আর সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত নয়। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি অনৈক্যের আবরণে আচ্ছাদিত। কিন্তু বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীর বিরোধিতায় এদেরকে প্রায়ই ঐক্যবদ্ধ হতে দেখা যায় এবং এর ফলে তৃতীয় বিশ্ব আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়টির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মর্যাদায় আসীন। অথচ আজ থেকে তিন চার দশক আগে পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তৃতীয় বিশ্বকে নিয়ে তেমন গুরুগম্ভীর আলোচনা করেনি। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-এর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করার সময় আমাদের এই দিকটির প্রতি নজর দিতে হবে। ফলে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিষ্ঠাসহকারে আলোচনা করে।

নবমত, অতীতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে মনে করা হত এবং কালক্রমে সে নিজেকে স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদায় বসিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিষয়টি সুসংগঠিত হয়ে উঠতে পারেনি বলে অনেকে মনে করেন। বিষয়টির এখনও পর্যন্ত কোনো স্পষ্ট এবং গ্রহণযোগ্য

Scanned with CamScanner

মডেল (model) তৈরি হয়নি। বিভিন্ন সময়ে যেসমস্ত ঘটনা ঘটছে সেগুলি থেকে কতকগুলি সাধারণ অনুমান তৈরি করা হয়। ফলে বিষয়টি আজও তার শৈশব অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারেনি বলে কেউ কেউ ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পামার ও পারকিনস বলেছেন (পৃ. XII) : Although international relations has emerged from its earlier status as a poor relation of political science and history, it is still far from being a well-organised discipline. It lacks a clearcut conceptual framework and a systematic body of applicable theory ; and it is heavily dependent upon other and for the most part better-organised disciplines. তবে অনেকে মনে করেন যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অন্য বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল হলেও বিগত অর্ধশতককালে এর ক্ষেত্রে বিশাল পরিবর্তন যে এসেছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। পামার ও পারকিনস-এর *International Relations* বইখানি ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপরে ৫০টি বছর আমরা অতিক্রম করেছি। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির স্বাধীনতা অর্জন, স্নায়ুযুদ্ধ, রাজনীতির দ্বিমেরুতা, স্নায়ুযুদ্ধের অবসান, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, বিশ্বায়ন প্রভৃতি বিষয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়টির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং এইসমস্ত তাৎপর্যবাহী ঘটনার প্রেক্ষিতে অনেকে বিষয়টির আলোচনাকে খুবই উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী করে তুলেছেন। তবে পরিবর্তনশীলতা এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলে আমরা মনে করি। কিন্তু তাই বলে এই পরিবর্তনশীলতা এর অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকের প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ করে না। বরং একে সজীব করে রেখেছে। আর নতুনকে আমন্ত্রণ জানানোর আগ্রহ একে নতুন মর্যাদা দিয়েছে। আর-একটি কথা বলা প্রয়োজন। সমাজবিজ্ঞানের কোনো বিষয়ই অন্য বিষয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা নয়। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সমাজবিজ্ঞানের শাখাগুলিকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে ফেলেছে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি

আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ও আলাপ-আলোচনায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি পদ দুটি পরস্পরের পরিবর্ত হিসেবে ব্যবহার করি। কিন্তু অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে সম্পর্ক এবং রাজনীতি কথা দুটি ভিন্ন অর্থ বহন করে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে ছাত্রছাত্রীদের সে-বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। প্রথমে দেখা যাক আন্তর্জাতিক রাজনীতি বলতে কী বোঝায়। আন্তর্জাতিক রাজনীতির বাস্তববাদী তত্ত্বের একজন অগ্রগণ্য প্রবক্তা মর্গেনথাউ (*Politics Among Nations*, p. 16) নেতিবাচক প্রেক্ষাপটে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে একটি শিক্ষামূলক বিষয় হিসেবে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ইতিহাস, সমকালীন ঘটনাবলি, আন্তর্জাতিক আইন এবং রাজনীতিক সংস্কার থেকে আলাদা। আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে আইনি বিধি (legal rules) ও প্রতিষ্ঠানের সম-পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। আন্তর্জাতিক রাজনীতি এইসমস্ত আইনি বিধির মাধ্যমে কাজ করে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহায্যে লক্ষ্য অর্জনে ব্যাপৃত থাকে। কিন্তু তাই বলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠান ও আইনের ভিন্ন বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করা যায় না (International politics cannot be reduced to legal rules and institutions. International politics operates within the framework of such rules and through the instrumentality of such institutions. But it is no more identical with them. p. 16)।

সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে অন্য একজন ব্যক্তি বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করেছেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতির গোড়ার কথা হল এর মতে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় মুখ্য কারক হল রাষ্ট্র বা জাতি-রাষ্ট্র। এদের নির্দিষ্ট ভূখণ্ডীয় এলাকা বা সীমানা থাকলেও কাজকর্ম সেই সীমানা অতিক্রম করে অন্য রাষ্ট্রের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তার থেকে জন্ম নেয় আন্তর্জাতিক রাজনীতি। অন্য রাষ্ট্রের ওপর প্রভাব থেকে জন্মলাভ করে মিথস্ক্রিয়া এবং এইভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতি একটি আকার পরিগ্রহ করে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির মতে আন্তর্জাতিক সমাজের মুখ্য কারক হল রাষ্ট্র। এই সমাজে অ-রাষ্ট্রীয় যেসমস্ত কারক আছে তারা যে ভূমিকা পালন করুক না কেন তাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হবে না। কিন্তু তাই বলে তাদের ভূমিকা বিবেচনার মধ্যে আনা যাবে না এমন কথা আন্তর্জাতিক রাজনীতি মনে করে না (International politics implies that states are the dominant actors in the field. If other actors are identified then their ability to 'act' autonomously must be seriously questioned. The moment the assumption about the state primacy ceases to be possible, then the term 'international' begins to look seriously deficient. *Penguine Dictionary of International Relations*)। সহজ কথা হল যখন রাজনীতি একটি রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক স্তরে গিয়ে উপস্থিত হয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে প্রভাবিত করে তখন তাকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি নামে অভিহিত করা যাবে। অতএব আন্তর্জাতিক স্তরে কেবল রাষ্ট্রই নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

Scanned with CamScanner

আন্তর্জাতিক রাজনীতি সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট

আমরা আন্তর্জাতিক রাজনীতির যে সংজ্ঞা দিয়েছি তার দিকে তাকালে দেখতে পাব যে এর পরিধি খুবই সংকীর্ণ। কারণ রাজনীতি কেবল জাতি-রাষ্ট্রগুলির মধ্যেকার মিথস্ক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে এবং এই মিথস্ক্রিয়া রাজনীতি-সংক্রান্ত। কিন্তু আমরা জানি যে বিশ্বরাজনীতির আঙিনায় বর্তমানে অনেক কারক আবির্ভূত হয়েছে এবং তাদের কাজকর্ম রাজনীতি-বিষয়ক নয়। ফলে অ-রাষ্ট্রীয় কারকগুলির ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেইসঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে সমৃদ্ধিশালী করে তুলছে। সুতরাং এমন মন্তব্য করা চলে যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি আন্তর্জাতিক রাজনীতির তুলনায় অনেক ব্যাপক এবং এই কথাটি পামার ও পারকিনস তাঁদের সুলিখিত বইতে নিম্নোক্তভাবে বিবৃত করেছেন : Students insist that international politics should deal with the politics of the international community in a rather narrow sense, centering on diplomacy and the relations among the states and other political units, whereas international relation is a term properly embracing the totality of the relations among peoples and groups in the world society, and forces, pressures and processes which determine the way men live and act and think. (p. XIV). আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যে একটি ব্যাপকতা, সামগ্রিকতা এবং বৃহত্তর প্রেক্ষিত আমরা দেখতে পাই। আন্তর্জাতিক রাজনীতি মূলত রাজনৈতিক বিষয়গুলি নিয়ে নিজেকে ব্যাপৃত রাখে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করলেও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ও এর আওতার মধ্যে এসে যায়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি wider and more versatile. এই দুটি শব্দ—wider ও versatile আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে বিশিষ্টতা দান করেছে। যদিও পণ্ডিতেরা আন্তর্জাতিক রাজনীতি আলোচনা করতে গিয়ে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটকে নির্বাচন করেন ও সংকীর্ণতাকে সযত্নে পরিত্যাগ করে থাকেন কিন্তু এই বিষয়ের "সিরিয়াস" ছাত্রছাত্রীরা উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা বিস্মৃত হন না।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যে সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট সেই বিষয়টি অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। যেমন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (অতঃপর কেবল আ. স.) এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি উভয়েই আলোচনা করে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে সরকার বা রাষ্ট্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেমন বাণিজ্যের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ বা সরকার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর কী দায়িত্ব অর্পণ করবে সেগুলি রাষ্ট্রের আওতায় এসে যায়। অর্থাৎ কোনো সরকার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে থাকতে দেয় না। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র কী ভূমিকা পালন করবে তা নির্ধারিত হবে রাজনীতির কুশীলবদের দ্বারা। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আজ একটি নিছক অর্থনীতির বিষয় হয়ে থাকতে পারছে না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে সরকার তার রাজনৈতিক লক্ষ্যকে কার্যকর করে তুলতে চায় এবং এর ফলে বিষয়টি ভিন্ন আকার ধারণ করে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি কেবল রাষ্ট্রের ভূমিকার দিকটির ওপর আলোকপাত করে। অন্যদিকে আ. স. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দিকগুলিকে একত্রিত করে আলোচনা করে। ফলে স্বাভাবিক-ভাবে আ. স.-এর পরিধি ব্যাপকতর হয়ে উঠেছে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি সীমিত গণ্ডির মধ্যে নিজেকে বন্দি করে রেখে তৃপ্ত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-এর মধ্যে আমরা দেখি যে মানবজাতি ও মানবসভ্যতার বিকাশ ও কল্যাণ কীভাবে সাধিত হবে সেদিকে নজর দেওয়ার কথা বলা হয়। ফলে আন্তর্জাতিক রেড ক্রশ, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ ইত্যাদি সবকিছু এরমধ্যে এসে যায়। আর এইসমস্ত ইস্যু আ. স.-এর মধ্যে স্বমহিমায় প্রোজ্জ্বল। আ. স. রাজনীতিকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রাখতে চায় না। কিন্তু রাজনীতির পরিমণ্ডলের বাইরে যে বৃহৎ জগৎ আছে সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চায়। ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সবকিছুকে গ্রহণ করেছে, কোনো কিছু বর্জন করেনি। সাম্প্রতিককালে বিশ্বায়ন আ. স.-এর এক্তিয়ারে এসে উপস্থিত হয়েছে এবং আ. স.-এর ছাত্রছাত্রীরা আন্তর্জাতিক সমাজের সদস্যদের ওপর বিশ্বায়নের প্রভাবের পরিমাণ ও গভীরতা নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনায় ব্যস্ত। আমরা জানি যে বিশ্বায়নের অনকগুলি দিকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড়ো দিক দুটি হল : রাজনীতি ও অর্থনীতি। বলা বাহুল্য, আ. স. তো এই দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেই। উপরন্তু বিশ্বায়নের অপরাপর দিক নিয়েও আলোচনা করে। বলা বাহুল্য যে বর্তমানে বিশ্বায়ন ও উদারীকরণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে।

পার্থক্য চূড়ান্ত নয়

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে যে পার্থক্যের নির্দেশ পণ্ডিতেরা করে থাকেন তাকে কোনোভাবে চূড়ান্ত বলে স্বীকার করা যায় না। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক রাজনীতির একজন দিকপাল হলেন অধ্যাপক মর্গেনথাউ। তিনি উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান তা মানেন না। তিনি বিষয়টিকে সম্পূর্ণ বাস্তববাদী দৃষ্টি দিয়ে বিচার করেছেন। তাঁর মতে আ. স. বা আ. রা. পদ যা হোক না কেন ভাববাদ বা আদর্শবাদের দ্বারা পরিচালিত নয়। বাস্তব

Scanned with CamScanner

অবস্থায় রাষ্ট্রগুলি বিদেশনীতি বা অভ্যন্তরীণ নীতি নির্ধারণকালে জাতীয় স্বার্থের কথা সর্বাগ্রে বিচার করে এবং তারপরে সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে দেখা যাচ্ছে যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নামক রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানটি খুবই সক্রিয় এবং এটি মানবতাবোধ, মূল্যমান (values) আদর্শ প্রভৃতি শাশ্বত ধারণাগুলিকে অস্বীকার না করলেও জাতীয় স্বার্থের কথা ভাবে এবং তা করতে গিয়ে যদি শাশ্বত মূল্যমানগুলি কিয়ৎ পরিমাণে উপেক্ষিত হয় তাকে সর্বান্তঃকরণে মেনে নেয়। মর্গেনথাউ-এর এই বিশ্লেষণ যদি আমরা মেনে নিই তাহলে ওপরে আমরা আ. স. ও আ. রা. এ দুয়ের মধ্যে যে পার্থক্যের কথা বললাম তার ঔজ্জ্বল্য অবধারিতভাবে ফিকে হয়ে আসে। জাতি-রাষ্ট্রগুলি মানবসভ্যতার অগ্রগতি ও মানবজাতির কল্যাণের কথা ভাবলেও শাশ্বত মূল্যবোধ এবং জাতীয় স্বার্থের মধ্যে সংঘাত দেখা দিলে শেষোক্তকে প্রাধান্য দেবেই। তাই যদি হয় তাহলে আ. স. বিষয়টি রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। তবে আ. স.-এর বিদগ্ধ ব্যক্তিরা সবাই মর্গেনথাউ-এর বিশ্লেষণের অংশীদার নন বলে আজও দুটি ধারণা স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছে।

বিষয়বস্তু ও পরিধি

বিশ শতকের তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে পণ্ডিতব্যক্তিদের আগ্রহ দেখা দিতে শুরু করেছিল। অবশ্য দ্বিতীয় মহাসমরের পরে বিষয়টি জনপ্রিয়তা ও ব্যাপকতা অর্জন করে। যা হোক, ওই শতকের তৃতীয় দশকে কোনো এক সময়ে জনৈক পণ্ডিতব্যক্তি খুবই দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সাধারণ অর্থে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয় নয়। যাঁরা বিষয়টি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পড়ান তাঁরা কেউই একটিমাত্র বিষয়ের মধ্যে আলোচনাকে বন্দি করে রাখতে পারেন না, সম্ভবও নয়। একাধিক বিষয়ের সমন্বয়ে আ. স. গঠিত। এর মধ্যে আইন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় স্থান করে নিয়েছে। আবার এইসমস্ত বিষয় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হলেও আসলে এরা শেষপর্যন্ত নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলেছে। ইতিহাস, ভূগোল আন্তর্জাতিক আইন, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয় যখন আ. স.-এর সীমানার মধ্যে প্রবেশ করে তখন অতীতে তাদের যে বিশেষত্ব ছিল তা বহুলাংশে হ্রাস পেয়ে যায় এবং এরা সবাই মিলে আ. স.-এর লক্ষ্যসাধনের মহান যজ্ঞে ব্রতী হয়। অর্থাৎ এইসমস্ত বিষয় একত্র মিলিত হয়ে আ. স.-কে সাহায্য করে কীভাবে সে তার কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে (We are not simply dealing with a group of subjects indiscriminately thrown together but with a group of subjects viewed from a common angle. Quoted by Palmer and Perkins p. XII)।

আজকের দিনের বিচারে উনিশ শতকে আ. স. ছিল না। কিন্তু বিষয়টির অস্তিত্ব অস্বীকার করার কারণ নেই। তখনকার দিনে আ. স. বলতে বোঝাত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যেকার সংঘাত, যুদ্ধ, শান্তিস্থাপনের জন্য উভয়পক্ষ বা বিভিন্ন পক্ষের প্রচেষ্টা, শান্তিচুক্তি সম্পাদন, পরে সুযোগ বুঝে তা লঙ্ঘন করা ইত্যাদি। কার্যত প্রথম মহাসমরের পরে যে 'লিগ অফ নেশনস' গঠিত হয়েছিল তারপর বা সেই সময় থেকে আ. স. একটি সুনির্দিষ্ট আকার গ্রহণ করে এবং দুই গোলার্ধের রাজনীতিবিদগণ একত্রিত হয়ে মতবিনিময় করেন যার উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বকে যুদ্ধের করালগ্রাস থেকে মুক্ত করে শান্তিস্থাপন করা। বলার কথা হল যে এই প্রচেষ্টার মধ্যে ছিল একটি মহান উদ্দেশ্য এবং সেটি হল মানবজাতির কল্যাণসাধন ও মানবসভ্যতার বিকাশকে ত্বরান্বিত করা। আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন রাষ্ট্র মত-বিনিময়ের মাধ্যমে যাবতীয় সমস্যার সমাধান করবে। এই প্রবণতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে আ. স. একটি নির্দিষ্ট আকার পেল। যুদ্ধ যাতে দেখা না দেয় সে-ব্যবস্থা করা, ব্যর্থ হলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধের মীমাংসা করা। এই দুটি আ. স.-এর বিষয়বস্তুর মর্যাদা পাওয়ায় উনিশ শতকে এর যে বিষয়বস্তু বা পরিধি ছিল তার সম্যক বিস্তৃতি ঘটে।

লক্ষ করার বিষয় হল লিগের গঠনতন্ত্রের মধ্যে সর্বপ্রথম আদর্শবাদ স্থান করে নিয়েছিল। বিশ্বের যেখানেই সংঘাত দেখা দিক না কেন লিগ তা দূর করার জন্য সচেষ্ট হবে এবং সংগঠনের সমস্ত সদস্য জোট তৈরি করে মীমাংসা করবে। অর্থাৎ আদর্শবাদ অথবা ভাববাদ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়বস্তুর মর্যাদা পেল। ই. এইচ. কারসহ একাধিক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ একে ইউটোপীয় বা কাল্পনিক ধারণা বলেছেন। আমরা মনে করি লিগের আমল থেকেই ভাববাদ আ. স.-এর অন্যতম বিষয়ের মর্যাদা পেয়ে আসছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নানা বিদ্যাবিষয়ক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক রাজনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের ওপর গবেষণা চালাবার জন্য পরিষদ গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে। এইরকম একটি উদ্যোগের হদিস আমরা পাই Council on Foreign Relations-এর তৈরি প্রতিবেদনে যা ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রতিবেদনে আ. স.-এর বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা আছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে আ. স.-এর মূল (basic) উপাদান হবে : রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বরূপ ও কাজ বা এর কার্যকর দিক যেসমস্ত উপাদান রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে সেগুলির ওপর আলোকপাত করা। সাম্প্রতিককালের আ. স.-এর ইতিহাস

Scanned with CamScanner

বিশ্লেষণ করা। আ. স.-এর লক্ষ্য হবে একটি স্থিতিশীল বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে নজর দেওয়া। একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে যে প্রকৃতপক্ষে আ. স.-এর বিষয়বস্তু খুবই ব্যাপক। কারণ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে মিথস্ক্রিয়া তৈরি হয় বা রাষ্ট্রগুলি যে সম্পর্ক স্থাপন করে তার লক্ষ্য হবে উপরি-উক্ত লক্ষ্য বা কাজগুলি সম্পাদন করা। গত শতকের পাঁচের দশকের মাঝামাঝি Carnegie Endowment for International Peace অনুরূপ একটি অনুসন্ধান কাজ চালায় এবং আ. স.-এর বিষয়বস্তু কী হবে তা নিয়ে আলোচনা করে। আলোচনা থেকে জানা যায় যে আ. স.-এর বিষয় হবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিচালনকারী শক্তিগুলি পর্যালোচনা করা। আন্তর্জাতিক জীবনের (international life) রাজনীতিক, আর্থনীতিক, সামাজিক প্রভৃতি জীবন বিশ্লেষণ করা। জাতীয়-শক্তির উপাদানগুলি খুঁজে বের করা ও তাদের মূল্যায়ন করা। জাতীয় স্বার্থকে সুরক্ষিত করে তোলা, জাতীয় শক্তির সীমাবদ্ধতাগুলি কী কী তা জানা। সেই সীমাবদ্ধতাগুলি দূর করার চেষ্টা চালানো। বৃহৎশক্তি ও ক্ষুদ্রশক্তির বিদেশনীতির মধ্যে তুলনা করা। **কার্নেগি এনডাউমেন্ট** আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-এর যে বিষয়বস্তুর কথা বলেছে তাকেও আমরা ন্যায়সংগত-ভাবে ব্যাপক আখ্যা দিতে পারি। অর্থাৎ বিশ্বের একাধিক রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে সম্পর্কস্থাপন না করে আন্তর্জাতিক সমাজে টিকে থাকতে পারে না এবং সম্ভবও নয়। বর্তমান বিশ্বে আমেরিকা হল সর্বাপেক্ষা বৃহৎশক্তি। কিন্তু এহেন একটি দেশকে ইরাক, ইরান বা কোয়েতের মতো ক্ষুদ্র দেশের ওপর নির্ভর করতে হয়। সুতরাং বিশ্বব্যবস্থায় কোনো রাষ্ট্রই আজকের দিনে গুরুত্বহীন নয় এবং এই মৌলিক সত্যটি সব রাষ্ট্র ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে যার ফলে পারস্পরিক আদানপ্রদান বা নির্ভরশীলতা অতীতের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আজকের দিনের আ. স. এই দিকটি আমাদের সবার সামনে তুলে ধরতে চায়।

গত শতকের পাঁচের দশকের শেষের দিক থেকে আ. স.-এর বিষয়বস্তু বা পরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। কারণ ওই সময় থেকে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি এক-এক করে রাজনীতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে আরম্ভ করে এবং তারা হয় জোটবদ্ধভাবে নতুবা এককভাবে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলির মুখ্য কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় যার ফলে এরা আ. স.-এর মূল্যবান কারক হয়ে উঠতে থাকে। বিশ শতকের প্রথমার্ধের আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও সম্পর্ক উত্তরের শিল্পোন্নত দেশগুলিকে কেন্দ্র করে গঠিত হয়েছিল। অবশ্য এরসঙ্গে যুক্ত ছিল উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ এবং পুঁজিবাদ ইত্যাদি ধারণা। কিন্তু ওই শতকের শেষের দশকগুলিতে আ. স. নয়া উপনিবেশবাদ, নয়া সাম্রাজ্যবাদ প্রভৃতি বিষয়ে অতিমাত্রায় আগ্রহী হয়ে পড়ে। ঘটনার নতুনত্ব ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন আ. স.-এর বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন আনতে সাহায্য করেছিল। আবার গত শতকের আটের ও নয়ের দশকে নয়া ঔপনিবেশবাদ নয়া সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্বায়নের প্রভাবে এক নতুন রূপ নিল এবং আ. স. তাকে অস্বীকার করতে পারল না।

বিশ্বায়ন আ. স.-এর পরিধির কীভাবে পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করেছে সে-বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। বিশ্বায়ন তার সামূহিক ক্ষমতা নিয়ে আবির্ভূত হওয়ার আগে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের জাতি-রাষ্ট্রগুলি যে পরিমাণ সার্বভৌমতা এবং অভ্যন্তরীণ ও বিদেশনীতি নির্ধারণে যে ধরনের স্বাতন্ত্র্য ভোগ করত বিশ্বায়ন পর্বে তাদের সেই স্বাতন্ত্র্য বা সার্বভৌমতার ব্যাপক সংকোচন ঘটে। কেবল তাই নয় বহুজাতিক সংস্থা এবং ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র জাতি-রাষ্ট্রের শাসককে রাজনীতিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে এবং রাষ্ট্রগুলি পরিস্থিতির চাপে পড়ে তা মেনে নিতে বাধ্য হয়। সুতরাং অতীতে আ. স. বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে গড়ে ওঠা মিথস্ক্রিয়াকে যেভাবে দেখত বিশ্বায়ন পর্বে এসে আ. স. সেই দৃষ্টিভঙ্গির বদল ঘটাতে বাধ্য হয়েছে। এককথায় বলা যেতে পারে যে বিশ্বায়ন এবং বিশ্বায়নজাত সমস্যা ও পরিস্থিতি আ. স.-এর একটি অত্যন্ত সজীব বিষয়ের মর্যাদায় আসীন। অথচ দ্বিতীয় মহাসমরের অব্যবহিত পরে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে এ নিয়ে ভাবতে হয়নি।

আজকাল সন্ত্রাসবাদ একটি বিশ্বসমস্যার মর্যাদালাভ করেছে। বিশ্বের এমন কোনো রাষ্ট্র নেই যা সন্ত্রাসবাদের কবলে পড়েনি। অতীতে সন্ত্রাসবাদটি কেবল অভিধানের একটি শব্দ হয়েছিল। এখন সন্ত্রাসবাদের নাম শুনলেই যে-কোনো শান্তিকামী মানুষ আতঙ্কবোধ করেন। কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে সন্ত্রাসবাদ বন্দি হয়ে না থাকার জন্য এটি আ. স.-এর একটি মুখ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। আ. স. নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন, বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান স্থাপনে যাঁরা উদ্গ্রীব এবং মানবজাতি ও মানবসভ্যতার কল্যাণের কথা যাঁরা সতত ভাবেন এমন সকলেই সন্ত্রাসমূলক কাজকর্মের অবসান চান যার ফলে এটি আ. স.-এর একটি বিষয় হয়ে উঠতে পেরেছে। রাষ্ট্রসংঘ ও বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগঠনও সন্ত্রাসবাদের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি নিয়ে উদ্‌বিগ্ন। আ. স.-এর যে-কোনো বইতে এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তর আলোচনা আমরা লক্ষ করে থাকি।

আ. স. কি কেবল ভাববাদী ভাবনাগুলিকে প্রাধান্য দেয়? এ সম্পর্কে সঠিক মন্তব্য করা মুশকিল। কারণ এই বিষয়টির

Scanned with CamScanner

মধ্যে যেমন ভাববাদ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে তেমনি আছে বাস্তববাদ। যেমন রাষ্ট্রসংঘের সনদে যে যৌথ নিরাপত্তা, বিশ্বের সর্বত্র ন্যায়বিচার স্থাপন, উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদের অবসান, মানবাধিকারের প্রয়োগ ইত্যাদি বলা হয়েছে এগুলিকে আমরা অক্লেশে ভাববাদী ভাবনার প্রকৃষ্টতম বহিঃপ্রকাশ বলতে পারি। আ. স. বিশেষ গুরুত্বসহকারে এগুলি নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু একইসঙ্গে বাস্তববাদ বিষয়ে আ. স.-এর মধ্যে আগ্রহের ঘাটতি আমরা দেখতে পাই না। মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদকে কেন্দ্র করে কূটনীতি, ইরাকের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের যৌথ আগ্রাসন, সন্ত্রাসবাদ দমনে বৃহৎ রাষ্ট্রের ব্যর্থতা, রাষ্ট্রসংঘকে সনদের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে না দেওয়া, মানবতাবোধ, মানবজাতির কল্যাণকে উপেক্ষা করে জাতীয় স্বার্থের বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলি আ. স.-এর মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। অর্থাৎ আজকের দিনের আ. স. ভাববাদ ও বাস্তববাদের সংমিশ্রণে গঠিত। কারণ আ. স. মনে করে যে ভাববাদ ও বাস্তববাদের মধ্যে যে বিতর্ক বিশ শতকের পাঁচের দশকে দেখা দিয়েছিল তার অবসান আজও হয়নি এবং অদূর ভবিষ্যতে হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না।

আ. স.-এর পরিধি অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যেতে পারে। যেমন বিশ শতকের নয়ের দশকের পর থেকে আ. স. বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রকে ভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে বিশ্লেষণ শুরু করে দিয়েছে। অতীতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রাষ্ট্রগুলিকে স্বতন্ত্র একক হিসেবে দেখত। বিভিন্ন ভূখণ্ডীয় রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক বা মিথস্ক্রিয়া গড়ে উঠলেও এরা যে রাজনীতিক ও অন্যান্য বিষয়ে স্বতন্ত্র সে বিষয়টি আ. স. বিশেষ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করত। এখনকার আ. স. প্রতিটি রাষ্ট্র স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম। কিন্তু তারা সবাই মিলে একটি ব্যবস্থা তৈরি করে নিয়েছে যাকে আ. স.-এর পণ্ডিতেরা রাষ্ট্রব্যবস্থা (state system) বলে অভিহিত করেছেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে একটি সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তবে এই সম্পর্কের মধ্যে রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি উপাদান স্থান করে নিয়েছে। সম্পর্কের চরিত্র যা হোক না কেন, একপ্রকার সম্পর্ক অন্য সম্পর্কের ওপর অবধারিতভাবে প্রভাব ফেলে। শেষপর্যন্ত আ. স. রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। রবার্ট জ্যাকসন ও জর্জ সোরেনসেন (Robert Jackson, Georg Sorensen) বলেছেন : Today I. R. is the study of the global state system from various scholarly perspectives. (pp. 2-3)। বিশ্বব্যবস্থা ভূখণ্ডীয় রাষ্ট্রসমূহকে বাদ দিয়ে একটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নয়। সব রাষ্ট্রের মধ্যে নানাবিধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং আ. স. সেই দিকটি সক্রিয় আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করে। আ. স.-এর মধ্যে কোথাও বিশ্বরাষ্ট্র বা বিশ্বসরকার ধারণাগুলি গুরুত্ব পায়নি। কারণ আ. স. মনে করে যে বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে এই দুটিকে কার্যকর স্তরে উন্নীত করা কোনোভাবে সম্ভব নয়। বিশ শতকের চারের দশকের গোড়ায় শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বসরকার ও বিশ্ব-রাষ্ট্রের কথা ভেবেছিলেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধিকাংশ সময় বাস্তববাদিতার পথ ধরে হাঁটলেও বিশ্বসরকার বা বিশ্বরাষ্ট্রের মতো অবাস্তব ধারণাকে প্রাধান্য দিতে চায় না।

বর্তমানের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অনেকগুলি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং এদের মধ্যে প্রধান হল বিভিন্ন রাষ্ট্র বা জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা এবং সমগ্র মানবজাতির বিকাশ ও মানবসভ্যতার অগ্রগতি। নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণের দায়িত্বটি রাষ্ট্রসংঘের ওপর ন্যস্ত থাকলেও প্রতিটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অধিকার থাকবে নিজের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। তাই আমরা দেখতে পাই যে সনদের মধ্যে আঞ্চলিক সংগঠনের ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার কতকগুলি রাষ্ট্র নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত করে তোলার মানসে আঞ্চলিক সংগঠন স্থাপন করতে পারবে। বিশ শতকের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশকে যেপ্রকার আ. স. ছিল তার মধ্যে একটি বা একাধিক জাতি-রাষ্ট্রের সামূহিক বিকাশের উপায় হিসেবে আঞ্চলিক সংগঠনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। আ. স.-এর এই দিকটিকে আমরা বিষয়বস্তুর লক্ষণীয় সম্প্রসারণ বলে মনে করতে পারি।

বর্তমানকালের আ. স. কতকগুলি প্রবণতার মধ্যে সমন্বয়-সাধন করেছে। যেমন মধ্যযুগে রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অস্তিত্ব থাকলেও আজকালকার দিনের মতো তারা সবাই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক ছিল না। আর সেই সময়কার পরিস্থিতিকে আ. স.-এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করা হত না। অর্থাৎ মধ্যযুগে কার্যত আ. স. ছিল না। তারপরে সার্বভৌম রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটল। জাতি-রাষ্ট্রগুলি সার্বভৌম ক্ষমতাকে মহামূল্যবান সম্পদ বলে মনে করতে লাগল যার ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাত একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠল। আ. স.-এর আলোচনা সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে মিথস্ক্রিয়াকেন্দ্রিক হয়ে পড়ল। কিন্তু পণ্ডিতেরা ও রাষ্ট্রনায়কেরা উপলব্ধি করলেন যে রাষ্ট্রগুলি যদি সার্বভৌমতার প্রতি এমনভাবে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাহলে নিরাপত্তা, বিকাশ, কল্যাণ অবধারিতভাবে বিঘ্নিত হবে। তাই জাতি-রাষ্ট্রগুলি প্রয়োজন-বোধের দ্বারা তাড়িত হয়ে নিজেদের মধ্যে বিশ্বব্যবস্থা (global system) স্থাপনের উদ্যোগ নিল। বলা যেতে পারে এই উদ্যোগ তারা পরিস্থিতির চাপে পড়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবনীয় সাফল্যের সুফল পেতে হলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের বিশেষ প্রয়োজন। আবার বিশ্বব্যবস্থা মানে স্বাতন্ত্র্যের সামূহিক

Scanned with CamScanner

বিসর্জন নয়। **আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে জাতীয়তার মিলনসেতু রচনা হল বিশ্বব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য।** আজকের দিনের আ. স. এই বিষয়টির দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে চায়। কারণ কোনো রাষ্ট্র কেবল টিকে থাকতে চায় না, এগিয়ে যেতে ও বিকশিত হতে চায় এবং দেখা গেছে আ. স. নানাভাবে এই দিকটির ওপর আলোকপাত করতে আগ্রহী। Today the system global in extent. The era of the sovereign state, coincides with the modern age of expanding power, prosperity, knowledge, science, technology, literacy, urbanisation, citizenship, freedom, equality rights etc. Jackson and Sorensen *op. it.* p. 9-10)।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে **আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একটি অত্যন্ত সজীব বিষয় এবং এর বিষয়বস্তু ও পরিধি ক্রমবর্ধমান।** এই ক্রমবর্ধমানতা বৈশিষ্ট্যটিকে যদি আমরা বিস্মৃত হই তাহলে বিষয়টির প্রকৃতস্বরূপ উদ্ঘাটনে ব্যর্থ হব। একদিকে যেমন রাষ্ট্রের ভাঙাগড়া আছে তেমনি নানা রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটছে এবং এর কারণ হল নানা উপাদানের প্রবেশ। আন্তর্জাতিক সমাজে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনাকে অন্য রাষ্ট্র উপেক্ষা করতে পারে না। বিশেষ করে যে-সমস্ত রাষ্ট্র পাশাপাশি অবস্থান করছে। পাকিস্তানে যদি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে বা সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা বৃদ্ধি পায় বা বাংলাদেশে ভারতবিরোধী কাজকর্মের জন্য ঘাঁটি তৈরি হয় ভারত তা উপেক্ষা করতে পারে না। আ. স. এই দিকগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়।

স্বতন্ত্র শাখা হওয়ার দাবি

কেন এই প্রশ্ন?

আলোচনার গভীরে প্রবেশের আগে একটি বিষয় খোলসা করে নেওয়া জরুরি বলে মনে করি এবং বিষয়টি হল—কেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে একটি স্বতন্ত্র বিষয় কি না তা নিয়ে আলোচনা করার কথা উঠেছে। গত শতকের ছয়ের দশক পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা আ. স.-কে মূল বিষয়ের একটি শাখা বা পত্র হিসেবে মনে করতেন। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর স্তরে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীরা যেসমস্ত পত্র বা বিষয় পড়তেন তাদের মধ্যে আ. স. ছিল একটি পত্র বা বিষয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা ইতিহাসের মতো আ. স. একটি আলাদা বিষয়ের মর্যাদা পায়নি। না পাওয়ার অন্যতম কারণ হল বিষয় হতে গেলে যেসমস্ত শর্ত পূরণ করা দরকার আ. স. তা পূরণ করতে পারেনি। যেমন এর কোনো তাত্ত্বিক মডেল গড়ে তোলা হয়নি। ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীরা যে আ. স. পড়তেন তা কেবল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যেকার যুদ্ধ, শান্তি ও চুক্তি সম্পাদন সংক্রান্ত বিষয়। ফলে ইতিহাসের ছাত্রছাত্রী, গবেষক, পণ্ডিত, অধ্যাপকেরা বর্ণনামূলক বিষয়ের বাইরে একে দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। কিন্তু বিগত চার/পাঁচ দশকে অনেকেই আ. স.-কে নিয়ে অনুসন্ধান চালান এবং বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করেন। তাঁরা আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মিথস্ক্রিয়াকে অবলম্বন করে তাত্ত্বিক কাঠামো ও মডেল প্রস্তুতির কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং বলতে থাকেন যে আ. স. একটি নিছক বর্ণনামূলক বিষয় নয়। ঘটে যাওয়া ঘটনাকে কেবল সাধারণভাবে বা আপাতদৃষ্টিতে বিচার করতে যাওয়া নিরর্থক। বিভিন্ন ঘটনা বিশ্লেষণ করে পণ্ডিতেরা আ. স. বিষয়ে কতকগুলি সাধারণ সূত্র প্রস্তুত করতে লাগলেন। আর এ কাজে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও নিগম বিপুল অর্থ বরাদ্দ করতে শুরু করে যার সাহায্যে অধ্যাপক ও গবেষকগণ বিষয়টির অনুপুঙ্খ আলোচনায় ব্রতী হন। তাঁরা শিল্পোন্নত দেশগুলির বিদেশনীতি এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলেন। কেবল তাই নয় বিভিন্ন শিল্পোন্নত রাষ্ট্রের আচরণ বিশ্লেষণ করার পর লক্ষ করলেন যে তার মধ্যে ধারাবাহিকতা এবং সামঞ্জস্য আছে। আবার প্রতিটি রাষ্ট্রের কাজের মধ্যে হয় বাস্তববাদিতা না হয় মতাদর্শ কাজ করছে। উদ্দেশ্যহীনভাবে রাষ্ট্র বিদেশনীতি তৈরি করে না বা রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন করতে চায় না। প্রতিটি আচরণ, পদক্ষেপ বা নীতির মধ্যে স্পষ্টভাবে বাস্তব পরিস্থিতি বা ভাবাদর্শ কাজ করে। এইভাবে যে আ. স. ছিল কেবল একটি বর্ণনামূলক বিষয় তার ভবিষ্যৎ এক নতুন ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করে দিল। আ. স.-এর মধ্যে ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় স্থান করে নিলেও বিষয়টি কিন্তু একটি স্বতন্ত্র ধারা (discipline) হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সফল হল। আ. স.-এর এই নতুন দিকনির্দেশ বা রূপ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অনেকে দাবি জানাতে লাগলেন যে একে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি শাখা বা লেজুড় হিসেবে গণ্য করা সঠিক কাজ নয়। দিনের পর দিন বিষয়টির কলেবর এত বৃদ্ধি পেল এবং সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র ও গবেষকগণ এ সম্পর্কে এত বেশি উৎসাহ দেখাতে লাগলেন যে তাঁরা একে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অথবা ইতিহাসের লেজুড় করে রাখতে চাইলেন না।

পক্ষে যুক্তি

ওপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে ছাত্রছাত্রীরা অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে একটি স্বতন্ত্র বিষয়ের মর্যাদায় বসানোর সময় আমাদের সামনে উপস্থিত। কিন্তু কেবল এই কথাগুলি বললে যথেষ্ট বলা হল না। স্বতন্ত্র বিষয়ের দাবির পেছনে যেসমস্ত যুক্তি আছে সেগুলি যথাযথভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

Scanned with CamScanner

(১) প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাষ্ট্রগুলির সক্রিয়তা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সে-কারণে রাজনীতিবিদ, প্রশাসক, কূটনীতিবিদ প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ নতুন নতুন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য খুবই তৎপর হয়ে উঠেছেন। কেবল এরা নন আ. স. বিষয়ে পণ্ডিত, গবেষক, অধ্যাপক প্রভৃতিদেরও ডাক পড়ে পরামর্শদানের জন্য। আ. স. সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে পরামর্শদানের জন্য নীতিনির্ধারকগণ বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক বা ছবি আঁকিয়েদের ডাকেন না। এই পরিস্থিতির ব্যাপক উপস্থিতি আমরা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে লক্ষ করি এবং এর থেকে পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত টেনেছেন যে বিষয়টির যদি স্বাতন্ত্র্য ও পর্যাপ্ত গুরুত্ব না থাকত তাহলে এমন ডাক পড়ত না। অষ্টাদশ বা উনিশ শতকে আ. স. যেমন ছন্নছাড়া বা বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ একটি বিষয় ছিল তেমনটি থাকলে এবং খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিতেরা যদি যুক্ত হয়ে না পড়তেন তাহলে নীতিনির্ধারণকারী গবেষক এবং পণ্ডিতদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য ডাকতেন না। ফ্র্যাঙ্কেল তাঁর বইতে (*International Politics*) লিখেছেন : Despite the misleading pretensions of some of their practitioners and their remoteness from real life, theoretical approaches to international relations are indispensable for some organisations of the overwhelming chaos of real life. আ. স. যে ঠাসবুনন যুক্ত এবং অকাট্য যুক্তিতে টইটুম্বুর বিষয়ের মর্যাদা পেয়ে গেছে এমনটি নয়। তবে সরকারের পররাষ্ট্রদপ্তরকে পরামর্শ দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করার মতো অবস্থা বিষয়টি অর্জন করেছে। বলা বাহুল্য, কেবল আমেরিকা নয়, আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি ও রাজনীতিতে যেসমস্ত রাষ্ট্র সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে চায় বা করছে তারা প্রায় সবাই আ. স. বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণে ইচ্ছুক এবং গ্রহণ করেও থাকেন। এহেন অবস্থায় একে স্বতন্ত্র বিষয়ের মর্যাদা না দিলে এর প্রতি চরম অন্যায় করা হবে।

(২) আ. স. একটি শাখা এই কথাটি বহুপ্রকার বিভ্রান্তির জনক। কেউ যদি বলেন যে অর্থশাস্ত্র সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা তাহলে কি এই অর্থ দাঁড়ায় এর স্বাতন্ত্র্য বলতে কিছুই নেই। বরং বলা উচিত যে অর্থশাস্ত্র সমাজবিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন এবং অতীব গুরুত্বপূর্ণ শাখা। একই যুক্তি আমরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি। কোনো অবস্থায় আ. স.-কে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা ইতিহাসের নগণ্য বা তাৎপর্যহীন শাখা হিসেবে গণ্য করা যায় না। পদার্থবিদ্যা যেমন ভৌতবিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা আ. স. তেমনি সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা। হয়তো এককালে বিষয়টি নিয়ে পণ্ডিতমহলে উৎসাহ ছিল না। কিন্তু আজকের দিনে সেই অবস্থা আর নেই। যে-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাচর্চার কেন্দ্রগুলিতে আ. স. নিয়ে বিদগ্ধজনের বিস্তর আগ্রহ লক্ষ করা যায় (Traditionalists generally regard international relations to be a subdivision of political science and philosophy but a subdivision with unique features that endow it with a separate identity. Theodore Coloumbis. *Relations, Powers and Justices*, p. 7)। একটি বিশাল বিষয়ের শাখা বলে আ. স.-কে হেয় মনে করা ঠিক নয়। বরং সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার তুলনায় আ. স.-এর গুরুত্ব অনেক বেশি। বৃহৎ ও মাঝারি সব রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক সমাজে নিজেদের গুরুত্ব ও ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে ও বাড়াতে চায় এবং তা করতে গিয়ে তাদেরকে অপরাপর রাষ্ট্রের সঙ্গে নানাভাবে সম্পর্কযুক্ত হতে হচ্ছে। আর সেই অবস্থাই আ. স.-কে একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে সবার সামনে তুলে ধরছে।

(৩) বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে অষ্টাদশ শতকে রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধ, চুক্তি সম্পাদন, চুক্তি লঙ্ঘন, আগ্রাসন ইত্যাদির মধ্যে নিজেদেরকে বন্দি করে রাখত। বর্তমানে যুদ্ধ আর প্রাত্যহিক ঘটনার স্তরে নেই। রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলে নানাপ্রকার গঠনমূলক ও কল্যাণমূলক লক্ষ্যসাধনের নিমিত্ত। এ কাজগুলি রীতিমতো ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। তদুপরি কোনো একটি রাষ্ট্র এককভাবে এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না। সঠিকভাবে এগোতে হলে যে-কোনো রাষ্ট্রকে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতেই হবে এবং এই প্রবণতা আজ এত বেশি বেড়েছে যে আ. স.-এর কলেবর আর সেই অতীতের অবস্থায় নেই। সম্পর্ক বহুমুখী বা বৈচিত্র্যপূর্ণ হচ্ছে, কোনো একটি রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে বিশ্বব্যবস্থা বা আন্তর্জাতিক সমাজ থেকে আলাদা হয়ে থাকতে পারে না। ফলে সম্পর্কের এই সম্প্রসারণ আ. স.-এর পরিধি ও বিষয়বস্তুকে নজিরবিহীনভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। এই অবস্থায় একে ইতিহাস বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি অখ্যাত শাখা হিসেবে রাখতে গেলে বিষয়টির ওপর অবিচার করা হবে।

(৪) কেউ কেউ বলেন (এবং সঠিকভাবে) যে আ. স. বিষয়টি আলোচনার মধ্যে অতীত দিনের যে মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তার অবসান ঘটেছে। অতীতে আ. স. কেবল বর্ণনার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রেখেছিল। আর আজকের দিনে বিশ্লেষক ও গবেষকগণ নানাপ্রকার উন্নতমানের পদ্ধতি প্রয়োগ করে এর আলোচনাকে সমৃদ্ধিশালী করে তুলেছেন। আলোচকদের মনে বিজ্ঞানমনস্কতা খুবই সক্রিয়। ঘটনাবলির নিছক বর্ণনা করাকে আ. স. বলা যায় না, আ. স. কেবল বর্ণনা করে না, বৈজ্ঞানিক যুক্তির সাহায্যে যে-কোনো ঘটনা বা পরিস্থিতির গভীরে প্রবেশ করে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির

Scanned with CamScanner

সাহায্যে অনুমান তৈরি করে। এই প্রসঙ্গে জনৈক আ. স. বিশেষজ্ঞের যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরছি : Members of the scientific school generally consider international relation to be too broad and complex a field to fit within the confines of political science or any other single discipline. (*Coloumbis* p. 6)। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করার অর্থ হল তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলিকে যথাযথ প্রেক্ষাপটে পর্যাপ্ত যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যা করে সিম্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আ. স. বিশেষজ্ঞরা আজকাল তাই করছেন। অবশ্য অর্থশাস্ত্র এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান এই পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে বিষয়ের গুণগত মান বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। আ. স. যদি তাই করে তাহলে কেন তাকে স্বতন্ত্র বিষয়ের মর্যাদা দেওয়া হবে না। তা ছাড়া আজকাল আ. স. আলোচনার জন্য নানাধরনের মডেল ব্যবহার করা হচ্ছে যা অতীতে করা হয়নি। ফলে বিষয়টি নানাভাবে নিজেকে এত বেশি উন্নত করেছে যে একে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা ইতিহাসের শাখা বিষয় হিসেবে দেখা সঠিক নয়। সম্প্রতি আ. স. সংখ্যাবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি থেকে আলোচনার কলাকৌশল সংগ্রহ করে আলোচনা করে। এই প্রবণতা বিগত তিন/চার দশক ধরে এত বেড়েছে যে সাধারণ পাঠক-পাঠিকা এই বিষয়টিকে সমীহ করে চলেন।

(৫) আগে আমরা বলেছি যে আ. স. সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ওপর একটু বেশি পরিমাণে নির্ভরশীল যে কারণে অনেকেই একে স্বতন্ত্র বিষয়ের মর্যাদা দিতে আগ্রহী নন। এই যুক্তির সারবত্তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। সমাজ-বিজ্ঞানের সমস্ত শাখাই কমবেশি একে অন্যের ওপর নির্ভর করে এবং তারা যদি স্বতন্ত্র বিষয়ের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত না হয় তাহলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হবে কেন। সমাজবিজ্ঞানের সমস্ত শাখাই পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল এবং এই বৈশিষ্ট্যকে অযোগ্যতা বা সীমাবম্ধতা হিসেবে বিচার করা ঠিক নয়। সমাজের নানাদিক নিয়ে তো সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করে এবং সমাজ তো একটি সামগ্র্য। তাকে কোনোওভাবে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সুতরাং আ. স.-কে সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা থেকে ধারণা ও পদ ধার করতেই হবে। কেবল সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা পরিলক্ষিত হয় তা নয়। ভৌতবিজ্ঞান, প্রাণবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কিছু পরিমাণে এই জাতীয় নির্ভরশীলতা আমরা লক্ষ করি। সুতরাং পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে অজুহাত করে আ. স.-কে স্বতন্ত্র বিষয়ের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা সঠিক কাজ হবে না বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

(৬) হফম্যান একটি ভিন্ন যুক্তির অবতারণা করে আ. স.-কে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে ঘোষণা করার কথা বলেছেন। তাঁর মতে আ. স. সমাজবিজ্ঞানের একটি বিষয় হলেও এর বিষয়বস্তু আলাদা। রাষ্ট্রবিজ্ঞান মূলত রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করে। রাষ্ট্র, সরকার, নাগরিক, প্রশাসন, আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ, দলব্যবস্থা ইত্যাদি হল প্রধানত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। আ. স. বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যেকার মিথস্ক্রিয়া, আন্তর্জাতিক সমাজে নানা রাষ্ট্রের ভূমিকা, আন্তর্জাতিক সংগঠন যেমন রাষ্ট্রসংঘ এবং আঞ্চলিক সংগঠন ইত্যাদি নিয়ে বিচারবিশ্লেষণ করে। একটি রাষ্ট্রের কাজকর্ম যদি ভূখণ্ডীয় এলাকার মধ্যে বন্দি থাকে তখন সেটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়ের মর্যাদা পায়। আবার সেই আচরণ ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করলে তা আন্তর্জাতিক হয়ে দাঁড়ায়। তখন অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আ. স. জাতি-রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে কোনোকিছু আলোচনা করে না। তবে দেখে যে এই জাতি-রাষ্ট্রের কর্মপরিধি ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করেছে কি না। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে আ. স.-এর বিষয় আলাদা। সন্ত্রাসবাদ নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আ. স. আলোচনা করলেও প্রসঙ্গ ও প্রেক্ষিত সম্পূর্ণ আলাদা। আন্তর্জাতিক সমাজে সন্ত্রাসবাদ কী পরিবেশ তৈরি করছে এবং তার ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যেকার সম্পর্কের চরিত্র কোথায় গিয়ে উপস্থিত হচ্ছে তা এই বিষয় পর্যালোচনা করে। এই দিকটি আমাদের মনে রাখতে হবে। সুতরাং একই বিষয় নিয়ে সমাজ-বিজ্ঞানের নানা শাখা আলোচনা করলেও প্রেক্ষিত স্বতন্ত্র হওয়ার জন্য বিষয় (subject) স্বতন্ত্র হতে বাধ্য। হফম্যান তাঁর *Contemporary Theory of International Relations* বইতে এই দিকটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে আরও বলা যায় যে আ. স.-এর বিষয়বস্তুর স্বাতন্ত্র্য দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। যেমন এখনকার আ. স.-এর যে-কোনো বইতে বিশ্বায়ন নিয়ে আলোচনা পাওয়া যাবে। অথচ এক দশক আগে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কোনো বইতে বিশ্বায়ন নিয়ে আলোচনা স্থান পায়নি। আবার কোনো কোনো বিষয় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্ব হারিয়েছে। যেমন বিশ শতকের পাঁচের ও ছয়ের দশকে যেসমস্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক গ্রন্থ লিখিত হয়েছিল সেগুলি স্নায়ুযুদ্ধ ও রাজনীতির দ্বিমেরুতা (bipolarity) নিয়ে বিস্তর আলোচনা করত। কিন্তু সাতের দশকের মাঝামাঝি স্নায়ুযুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস পেয়ে যাওয়ায় এর গুরুত্ব কমে যায়। নয়ের দশকের গোড়ায় সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটায় রাজনীতির দ্বিমেরুতা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। কিন্তু অন্য একটি বিষয় আ. স.-এ সংযোজিত হয়েছে এবং তা হল স্নায়ুযুদ্ধের পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক রাজনীতির চরিত্র কেমন

Scanned with CamScanner

আকার ধারণ করেছে। বিষয়বস্তুর হ্রাসবৃদ্ধি সমস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে ঘটছে এবং আ. স. ব্যতিক্রম নয়। বলবার কথা হল আ. স.-এর বিষয় আলাদা এবং যদিও আ. স. অন্যান্য বিষয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করে প্রেক্ষিত আলাদা হয়ে যায়।

(৭) আমরা আগেই বলেছি যে সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গবেষকগণ একাধিক উন্নতমানের কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করে থাকেন এবং তাঁদের এই প্রচেষ্টা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে ও বিষয়কে সমৃদ্ধিশালী হতে সাহায্য করেছে। আবার একই কৌশল রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাজনীতিশাস্ত্র বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার করেন। কিন্তু একই পদ্ধতি উভয়শাস্ত্রে প্রযুক্ত হলেও প্রয়োগের ব্যাপারে তারতম্য দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ আমরা ক্রীড়াতত্ত্বের অবতারণা করতে পারি। ক্রীড়াতত্ত্বটি (Theory of Games) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আ. স.-এ ব্যবহৃত হলেও ফলাফল ও অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্য প্রমাণ করে যে আ. স. বিষয় হিসেবে স্বতন্ত্র। হফম্যান বলেছেন যে অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষিত সম্পূর্ণ আলাদা। অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কারক হল নাগরিক, বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী, রাজনীতিক দল, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ইত্যাদি। এরা যখন সক্রিয় অবস্থায় বিরাজ করে তখন ক্রীড়াতত্ত্বের সাহায্যে তাদের সর্বপ্রিয়তা ও মিথস্ক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু বিশ্বরাজনীতির কারক এরা নয়। সেখানে জাতি-রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক সংগঠন, রাষ্ট্রসংঘ, আঞ্চলিক সংগঠন, বহুজাতিক সংস্থা হল কারক। এরা যে জাতীয় মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত সেটি জাতীয় স্তরের মিথস্ক্রিয়া থেকে আলাদা। সুতরাং আমরা বলতে পারি না যে দুটি বিষয়ের আলোচনা পদ্ধতি এদেরকে এক করে ফেলেছে। কেবল ক্রীড়াতত্ত্ব নয়, অন্যান্য অনেক পদ্ধতি উভয়বিষয়ে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। সুতরাং আ. স.-কে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা ইতিহাসের অংশ হিসেবে গণ্য করা অনুচিত। হফম্যান এই দিকটির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

(৮) রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলি যে অভ্যন্তরীণ সমাজ নিয়ে আলোচনা করে সেই সমাজের ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিত করা বা যাতে সংহত হয় তার উপায় বাতলে দেওয়া। কিন্তু আ. স. কেবল আন্তর্জাতিক সমাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং এই বিষয়ের ছাত্রছাত্রীরা কদাপিও ভাবেন না যে আন্তর্জাতিক সমাজ যেসমস্ত একককে নিয়ে গঠিত তাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হোক। কেবল একটি বিশ্বরাষ্ট্র বা বিশ্ব-সরকার আন্তর্জাতিক সমাজের এককগুলির মধ্যে সংহতি আনতে পারে। কিন্তু বিশ্বসরকার গড়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই। ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের লক্ষ্য বিশ্বের নানা অঞ্চলের মধ্যে ঐক্যসাধন করা নয়। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির এই ভিন্নমুখী লক্ষ্য সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করে যে বিষয় দুটি সম্পূর্ণ আলাদা। এই প্রসঙ্গে আরও বলা যায় যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আ. স.-এর আরও অনেক ভিন্নমুখী লক্ষ্য আছে। একই যুক্তি প্রয়োগ করে বলা যেতে পারে যে আ. স. ইতিহাস থেকেও আলাদা।

(৯) অভ্যন্তরীণ রাজনীতির মুখ্য চালিকাশক্তি হল রাষ্ট্র যার হাতে আছে সার্বভৌম ক্ষমতা এবং রাষ্ট্র নানা প্রয়োজনে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে নানাপ্রকার বিরোধের মীমাংসা করে এবং প্রয়োজন হলে বল প্রয়োগের সাহায্যে আনুগত্য আদায় করে। আন্তর্জাতিক সমাজে এই জাতীয় কোনো সার্বভৌম শক্তি নেই এবং আন্তর্জাতিক সমাজের সদস্যগণ কোনো একটি সংস্থার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য নয়। এমনকি রাষ্ট্রসংঘ পর্যন্ত তার সদস্যদের সার্বভৌমতা মেনে নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আ. স. ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু এবং আলোচনা পদ্ধতি যে এক হবে না সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

(১০) দুটি বিষয়ের বিশ্লেষকদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য আছে। যেসমস্ত পণ্ডিতব্যক্তি ও অধ্যাপক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন, প্রথম থেকেই তাঁদের মনে এই ধারণা তৈরি হয়ে যায় যে তাঁরা এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন যা সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং এই মনোভাব এমন সক্রিয় অবস্থায় থাকে যে তাঁদের আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা ইতিহাসের আলোচনা থেকে পৃথক, ফলে শেষপর্যন্ত আ. স.-এর আলোচনা যে-কোনো বিষয় থেকে আলাদা হয়ে পড়ে। প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশযজ্ঞ কুইন্সি রাইট (Qunicy Wright) এই দিকটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

(১১) আ. স.-এর আলোচনার পরিধি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আ. স. আলোচনাকে সীমাবদ্ধ করে রাখতে চায় না। গত শতকের পাঁচের দশকে এর বিষয়বস্তু যে অবস্থায় ছিল একবিংশ শতকের গোড়ায় তার কলেবর অনেকগুণ বেড়েছে। সেই তুলনায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু তেমন বাড়েনি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ কতকগুলি মৌলিক ধারণা নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। অবশ্য আলোচনার প্রেক্ষিত বদলে যাচ্ছে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার মধ্যে আমূল নতুন কোনো ইস্যু নেই। অন্যদিকে আ. স.-এর মধ্যে নতুন ইস্যু ঢুকে পড়ছে। আর নতুন নতুন ইস্যুর প্রবেশ অবিরত যে ঘটছে তার উল্লেখ আগেই করেছি।

বিপক্ষে যুক্তি

আ. স.-কে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিষয়ের মর্যাদাদানের পক্ষে কয়েকটি যুক্তি আমরা দেখালাম। কিন্তু এই যুক্তিগুলি সকলে একবাক্যে মেনে নিতে চান না। তাঁরা যেসব যুক্তি

Scanned with CamScanner

সচরাচর প্রদান করে থাকেন সেগুলির কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল।

প্রথমত, সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখাকে স্বতন্ত্র হতে গেলে সবার আগে প্রয়োজন তার একটি নিজস্ব মডেল ও আলোচনা পদ্ধতি এবং এই মাপকাঠি দিয়ে বিচার করে আমরা বলতে পারি যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-এ আজ পর্যন্ত এমন কোনো মডেল কেউ তৈরি করতে পারেননি এবং সে-কারণে একে একটি স্বতন্ত্র শাখার (discipline) সম্মান দেওয়ার প্রশ্ন উঠতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, একটি সর্বজনগ্রাহ্য বা বহুজনগ্রাহ্য মডেল আ. স.-এর জন্য প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। কারণ আ. স.-এর বিষয়বস্তু হল আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি যা প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে। সুতরাং দ্রুত পরিবর্তনশীল বিষয়কে নিয়ে একটি স্থায়ী মডেল বানানো সম্ভব নয়। আর তাই যদি হয় এর কোনো তাত্ত্বিক কাঠামো গড়ে তোলা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার এবং সে-কারণে একে স্বতন্ত্র শাখা বলে বিবেচনা করা যায় না। সমাজবিজ্ঞানের একটি তাৎপর্যহীন শাখা হিসেবে থেকে যেতে হবে।

তৃতীয়ত, আমরা ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতিকে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে গণ্য করে থাকি। একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে যে এই বিষয়গুলি ভৌগোলিক গন্ডির মধ্যে গড়ে উঠেছে এবং জাতি-রাষ্ট্রের উপাদান নিয়ে পরিপুষ্ট হয়েছে। আমরা বলি ভারতের ইতিহাস বা ইংল্যান্ডের ইতিহাস বা ভারতের রাষ্ট্রচিন্তা ইত্যাদি। কিন্তু এমন মন্তব্য কদাচ করি না যে ভারতের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বা চিনের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ একককে নিয়ে যে বিষয় রচিত তার মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা বা শৃঙ্খলার যে অস্তিত্ব থাকবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। অপরদিকে বিশ্বের নানা দেশের সম্পর্ক যে ধারার বিষয়বস্তু তার মধ্যে শৃঙ্খলার সম্যক উপস্থিতি থাকবে এমন কোনো নিশ্চয়তা অবশ্যই নেই। ফলে আ. স.-এর মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ আলোচনা প্রত্যাশা করা বৃথা। অথচ একটি বিষয়ের মধ্যে শৃঙ্খলার উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।

চতুর্থত, আমরা আগেই বলেছি যে আ. স.-এর মধ্যে ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, কূটনীতি, ভূ-রাজনীতি, এমনকি নীতিবিদ্যাও স্থান করে নিয়েছে। যে বিষয়ের মধ্যে এতগুলি বিষয়ের সমাহরণ ঘটেছে তাকে কোন্ যুক্তিতে একটি স্বতন্ত্র বিষয় নামে অভিহিত করা যাবে তা বোধগম্য নয়। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-এর বিশুদ্ধতা নিয়ে যে সংশয় আছে তার মূলোৎপাটন একেবারে সম্ভব নয় এবং এই অসম্ভবতা এর স্বতন্ত্র শাখা হওয়ার পথে প্রধান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

পঞ্চমত, ব্রিটেন আমেরিকা প্রভৃতি দেশে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও ভারতসহ অনেক উন্নয়নশীল দেশে বিষয়টি এখনও পর্যন্ত এই স্বীকৃতি পায়নি। তবে স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি না পেলেও এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেননি। ভারতে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। তবে এর মধ্যে কেবল আ. স.-এর তাত্ত্বিক দিক নেই, আছে ইতিহাস ও কূটনীতি। এখানে বিষয়টির স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত নয়।

উপসংহার

আ. স. একটি স্বতন্ত্র বিষয় হওয়া উচিত এই দাবির পক্ষে ও বিপক্ষের যুক্তিগুলি আমরা সবিস্তারে বিবৃত করলাম। উভয়পক্ষের যুক্তির মধ্যে সারবত্তা থাকলেও চূড়ান্ত বিশ্লেষণে আমাদের অন্য কথা বলতেই হয়। আমরা যুক্তিসংগতভাবে বলতে পারি যে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার পেছনে যেমন কিছু জোরালো যুক্তি আছে তেমন আছে আবেগ। অনেকে মনে করেন যে আ. স. একটি স্বতন্ত্র ধারা (discipline) হলে এর মর্যাদা বাড়বে এবং অনেকে আগ্রহ নিয়ে বিষয়টি পড়বেন এই ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবোচিত বলে আমরা মনে করি না। আ. স. একটি দ্রুত পরিবর্তনশীল বিষয় এবং এর মধ্যে যেসমস্ত তথ্য, ঘটনা, উপাদান প্রভৃতি থাকে যে-কোনো অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির মনে বিষয় সম্পর্কে জানার আগ্রহ সঞ্চার করবে। ইতিহাস বা অর্থশাস্ত্রের ছাত্রছাত্রীরা আ. স. নিয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধান চালাতেই পারেন এবং আজকাল এমন অনেক ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যেতেই পারে। কিন্তু এহেন ব্যক্তিরা অনুসন্ধান চালাবার আগে অবশ্যই ভাবেন না যে আ. স. স্বতন্ত্র ধারা কি না একবার খতিয়ে দেখা হোক।

একটি বিষয়ের মর্যাদা, গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি নির্ভর করে একাধিক উপাদানের ওপর যাদের মধ্যে প্রধান হল ধারাটির বিষয়বৈচিত্র্য, বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক এবং সর্বোপরি এরসঙ্গে যাঁরা নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত তাঁরা প্রশাসন ও নীতিনির্ধারকদের ওপর কী পরিমাণ প্রভাব স্থাপন করতে পেরেছেন বা পারছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আমরা বলতে পারি যে আ. স. একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, উৎসাহ সৃষ্টিকারী আধুনিক সমাজের বিষয়। কয়েক দশক আগে পর্যন্ত তেমন চিন্তাশীল ব্যক্তি এই বিষয় সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করতেন না। কিন্তু আজ সেই অবস্থা নেই। যাঁরা উৎসাহ বা আগ্রহ দেখাচ্ছেন তাঁরা এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, স্বতন্ত্র বিষয় কি না তা তাঁরা ভেবে দেখার কথা আদৌ ভাবেন না। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একটি স্বতন্ত্র

Scanned with CamScanner

বিষয় কি না সে প্রশ্ন তোলা এবং নানা যুক্তিজাল বুনে তাকে সফেন করে তোলা নিরর্থক।

আবার একে একটি স্বতন্ত্র ধারার মর্যাদা দেওয়ার প্রচেষ্টা চালানোকে আমরা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করি। সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় হলেও আ. স.-কে ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় থেকে উপাদান সংগ্রহ করতেই হবে। তা করলেও এর মর্যাদাহানি আদৌ হবে না। কারণ সমাজবিজ্ঞানের কোনো শাখাই একশো শতাংশ বিশুদ্ধতা দাবি করতে পারে না। তাই যদি হয় তাহলে আ. স. অন্য বিষয় থেকে উপাদান সংগ্রহ করে সে যদি নিজেকে পরিপুষ্ট করে তোলে, তার অপরাধ হবে কেন? তবে আ. স.-এর গবেষকগণ উন্নতমানের গবেষণাপদ্ধতি প্রয়োগ করে একে যদি সমৃদ্ধিশালী করে তুলতে সক্ষম হন এবং নীতি-নির্ধারকদের ওপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়, বিষয়টির মর্যাদা আপনা হতে বেড়ে যাবে। পরিশেষে বলি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয়ের মর্যাদা পাবে কি না তা হল একটি non-issue এবং একে নিয়ে মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করতে যাওয়া সঠিক নয়। বরং আলোচনা পদ্ধতিকে উন্নত করে তোলা প্রয়োজন।

Scanned with CamScanner